কারণ, আমি ঘুমাতে পারি না
জালালুদ্দিন রুমির প্রেমের কবিতা

অনুবাদ
আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

ঐতিহ্য

উ ৎ স র্গ

আমার দুই সহপাঠী সুখী দম্পতি
মাকসুদা লিরা ও মোশতাক মেহেদী

সূচিপত্র

প্রেমের পানে তাকাও ৩৩
আল্লাহর মহিমা ৫০
কারণ, আমি ঘুমোতে পারি না ৫৪
হৃদয়ের সৌন্দর্য ৫৫
বুদ্ধিজীবী প্রদর্শনে বিশ্বাসী ৫৬
প্রেম হলো জীবনের পানি ৫৭
আমার দরজায় কে? ৫৮
গীতিকবিতা ৬০
চতুর্পদী ৬১
একশ ধরনের ইবাদত ৬২
সুখের একমুহূর্ত ৬৩
আল্লাহর বাণীর মানবিক রূপ ৬৪
ধৈর্যধারণ করো ৬৫
আমি শুদ্ধতার পানিতে গলে যাই ৬৬
জীবনের যেকোনো সময় ৬৭
ভালোবাসার জন্য ৬৮
যে আত্মা অমৃত পান করে ৬৯
যন্ত্রণায় কাতর না হলে ৭০
একটি মোমবাতি ৭১
আর কতকাল ৭২
অসীমতার প্রেম ৭৩
আমি নিজের গভীরতা দেখি ৭৪
শেষ পর্যন্ত ৭৫
নিঃসঙ্গতা ৭৬
তোমার আত্মায় জীবনের শক্তি ৭৭
আমার মুখে কে কথা বলে? ৭৮
ছায়া এবং আলোর উৎস ৭৯
ভোরের স্বাদ ৮০
৮১ দুই ধরনের জ্ঞান
৮২ আমরা সত্তা বণ্টন করি
৮৩ বীজ কেনাবেচার বাজার
৮৪ অতিথিশালা
৮৫ দুই বন্ধু
৮৬ আমি বিলম্ব করেছি
৮৭ যদি দৃশ্যমান কিছু পেতে চাও
৮৮ এখন আমাদের যা আছে
৮৯ একটি পথ আছে
৯০ ভোরের মৃদুমন্দ বায়ু
৯১ পাখির গান
৯২ এখানে নয়
৯৩ সন্ধ্যার সাথে কোনো কৌশল নয়
৯৪ হালকা বাতাস
৯৫ শুধু সেই নিশ্বাস
৯৬ বহমান পানি
৯৭ ধারণা ছাড়িয়ে
৯৮ আত্মার সম্প্রদায়
৯৯ কে এই পরিবর্তন করে
১০০ দেহের নিদ্রাই আত্মার জাগরণ
১০১ প্রেমের বিবরণ
১০২ ভূমিকা
১০৫ তোমার জন্য আমার মুখে আগুন
১০৬ ওখানে কী মধুরতা লুকানো আছে
১০৭ বেহেশতের ছাদ নামিয়ে আনো
১০৯ আমি কি তোমাকে বলিনি
১১০ ঝরনার পানির সোরাহি
১১১ সুরুয়ার মাঝে আল্লাহ!

জামা খুলে ফেলা ১১২
উড্ডয়নের পথ ১১৩
পর্বত শীর্ষে গর্ত ১১৪
খোলা জানালা ১১৫
উত্তরের বাতাস ১১৬
প্রবেশপথ ১১৭
উন্মোচনকারী ১১৮
একটি মুখের নীরব উচ্চারণ ১১৯
প্রেমিকরা জেগে ওঠো ১২১
লাইলি এবং খলিফা ১২২
উত্তমরূপে তৈরি রুটি ১২৩
মানুষ সুখী হতে চায় ১২৪
বিরাট একটি বাহন ১২৫
মিশ্র জাতের একটি আপেল ১২৬
তোমার মুখ খুঁজছি ১২৭
আকাঙ্ক্ষা ১২৮
আমার প্রিয়তমা ১২৯
জাগ্রত আবেগ ১৩০
প্রেমের পথ ১৩১
তোমার মাঝে আমার সৌন্দর্য ১৩২
ঠিক এমন ১৩৩
প্রেমিক-প্রেমিকা ১৩৫
‘মান্না ও সালওয়া’ ১৩৬
এই মুহূর্তের মূল্য দাও ১৩৭
প্রতি মুহূর্তে আমি প্রতিমা গড়ি ১৩৮
আল্লাহর মানুষ ১৩৯
১৪০ পানি হলো ‘জিকর’
১৪১ আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন
১৪৩ ক্লান্তিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলো না
১৪৪ আমাকে ছাড়া যেও না
১৪৫ আমাকে অনুভব করতে চাই
১৪৬ আমাকে খুঁজে পেয়েছ
১৪৮ এসো, পরস্পরকে ভালোবাসি
১৪৯ যখন আমি নিদ্রিত
১৫০ আমি যদি কাঁদি
১৫১ আনন্দের সাথে খোঁজো
১৫২ তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি না
১৫৩ আমার মা সৌভাগ্য, বাবা উদারতা
১৫৪ জিহ্বা দিয়ে বিভ্রান্ত করব
১৫৫ সৃষ্টির প্রতি চোখ বন্ধ রাখি
১৫৬ শত্রুর বিদ্রুপ হৃদয়ে শুনি
১৫৭ কে আমার হৃদয়ের ঘরে?
১৫৮ ঘোড়ার আরোহী
১৫৯ আরো তারকা আছে
১৬০ প্রেমের আগুনে দহন
১৬১ সূর্য কূপের মাঝে অস্ত যায়
১৬২ অনন্ত প্রেম
১৬৩ আল্লাহ আমার হৃদয়ে
১৬৪ ভালোর জন্য যাওয়া
১৬৫ আমি আমার বুকে দোলা দেই
১৬৬ প্রেম ছুরি হাতে এগিয়ে আসে
১৬৭ গভীরভাবে শোনা

ভূমিকা

জালালুদ্দিন রুমি ১২০৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর বর্তমান আফগানিস্তানের বলখ নগরীর কাছে ইসলামি আইনবিদ, ধর্মতত্ত্ববিদ ও সুফিবাদী দীর্ঘ ঐতিহ্যের অধিকারী এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ওই এলাকা তখন পারস্য সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। রুমি যখন সবে কিশোর বয়সি, ঠিক তখন পশ্চিম দিকে আড্রিয়াটিক সাগর পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তারকারী চেঙ্গিস খানের অগ্রবর্তী বাহিনীর অভিযানের ঠিক আগে তাঁর পরিবার বলখ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বলা হয়ে থাকে যে, রুমির পিতা বাহাউদ্দিন নব্বইটি উটের পিঠে তার বই চাপিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন। রুমি ও তাঁর পরিবার প্রথমে দামেশক এবং সেখান থেকে যান নিশাপুরে, যেখানে খ্যাতনামা কবি ও ওস্তাদ ফরিদউদ্দিন আত্তার কিশোর রুমিকে ভবিষ্যৎ মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিনতে পারেন। এমন কথাও প্রচলিত আছে যে, রুমির পিতা বাহাউদ্দিনকে ফরিদউদ্দিন আত্তার তাঁর দিকে আসতে দেখেন এবং তাঁর কিছু পেছনে ছিলেন রুমি। তিনি বলে ওঠেন, "একটি সমুদ্রের আগমন ঘটছে, সে সমুদ্রকে অনুসরণ করে আসছে একটি মহাসমুদ্র।" এই অন্তর্দৃষ্টির সম্মানে তিনি রুমিকে তাঁর গ্রন্থ 'ইলাহিনামা'র (আল্লাহর গ্রন্থ) একটি কপি উপহার দেন।

শেষ পর্যন্ত রুমির পরিবার বর্তমান তুরস্কের দক্ষিণ-মধ্য এলাকায় অবস্থিত কোনিয়ায় স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে, যেখানে বাহাউদ্দিন দরবেশি তরিকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাদ্রাসার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বেশ কয়েক বছর পর পিতা ইন্তেকাল করেন এবং রুমি মাত্র বিশোর্ধ্ব বয়সে মাদ্রাসার প্রধান নিয়োজিত হন। গভীর জ্ঞানসম্পন্ন নিষ্ঠাবান ওস্তাদ হিসেবে তিনি ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর মাদ্রাসায় ছাত্রসংখ্যা ছিল দশ হাজারের বেশি। ব্যাপক অর্থে রুমির তরিকাপন্থিদের কাজ ছিল ব্যক্তিকে উন্মোচন ও যৌথ হৃদয়ের অন্তর্ভুক্ত করা। এই তরিকার সদস্যরা সংগীত ও কবিতা চর্চা করতেন। তারা নীরবে বসতেন, সংলাপ শুনতেন— কাহিনি, হাস্য-পরিহাস, ধ্যান—সবকিছুর চর্চা হতো। তারা উপবাস করতেন এবং ভোজেও মিলিত হতেন। রুমির এই দলে আহিম বা'য নামে একজন পাচক ছিলেন, যিনি তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যক্তিত্ব, এখনো কোনিয়ায় তাঁর রওজা মোবারক বিদ্যমান। রুমির তরিকার সদস্যরা একসাথে হাঁটতেন। তারা উদ্যান ও ফলের বাগানে কাজ করতেন। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তারা কখনো জান্তব আচরণ পালন করতেন, যা ছিল এক ধরনের লিখিত সংকেত।

এটি সংসার ধর্ম পরিত্যাগকারী কোনো সমাজ ছিল না। প্রত্যেকেরই পরিবার ছিল এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিল রাজমিস্ত্রি, মুদি দোকানি, তাঁতি, সূত্রধর, টুপি প্রস্তুতকারী, দরজি, পুস্তক বাঁধাইকারী। তারা সবাই নিজ নিজ কাজে আত্মনিবেদিত ছিলেন। এসব কাজ ছিল ভাবাচ্ছন্নতার ইতিবাচক দিক। অনেকে তাদের বলতেন সুফি। আমি বলতে চাই যে, তারা হৃদয়ের পথে জীবনযাপন করতেন।

বাহাউদ্দিনের মৃত্যুর কয়েক বছর পর ১২৩১ সালে কোনিয়ার উত্তর-পূর্ব দিকে বেশ দূরের এক পার্বত্য অঞ্চল থেকে বুরহান মাহাক্কিক নামে একজন দরবেশ ফিরে এসে জানতে পারেন যে, তাঁর ওস্তাদ, অর্থাৎ রুমির পিতা বাহাউদ্দিন ইন্তেকাল করেছেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, অবশিষ্ট জীবন তিনি তাঁর ওস্তাদের পুত্রকে দীক্ষা দেওয়ার কাজে নিবেদিত থাকবেন। পরবর্তী নয় বছর পর্যন্ত তিনি রুমিকে অনেক সময় একাদিক্রমে তিনটি চল্লিশ দিবস (চিল্লা) উপবাসব্রত পালনের দীক্ষা দেন। রুমি এই সুফি ঐতিহ্যের মাঝে আনন্দের উৎসের সন্ধান পান।

রুমির বড় ছেলে সুলতান ওয়ালাদ তাঁর পিতার ১৪৭টি ব্যক্তিগত চিঠি এত বিস্ময়করভাবে সংরক্ষণ করেছিলেন, যার মাঝে প্রায় আটশ বছর আগে রুমির প্রাত্যহিক জীবনের অনেকটাই যথার্থ চিত্র পাওয়া যায়। তিনি সংঘবদ্ধ জীবনে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। একটি চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে, এক ব্যক্তিকে তিনি পনেরো দিন ধরে অনুনয় করেছেন তাঁর নিকট থেকে অপর এক ব্যক্তি যে অর্থ ধার নিয়েছিলেন তা আদায় করতে সহায়তা করার জন্য। আরেকটি চিঠিতে তিনি এক বিত্তবান অভিজাতকে অনুরোধ জানিয়েছেন একজন ছাত্রকে সামান্য পরিমাণে অর্থ ধার দিতে। একজনের আত্মীয়রা এক বৃদ্ধা ধার্মিক মহিলার কুঁড়েঘরে গিয়ে ওঠেন এবং রুমি চেষ্টা করেন উদ্ভূত পরিস্থিতি সামলাতে। চিঠিগুলোতে বাস্তব জাগতিক কাজের মধ্যেও কবিতার লাইন উঠে এসেছে বিক্ষিপ্তভাবে। তাঁর জীবন ছিল আবশ্যকীয় দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডকেন্দ্রিক এবং একই সাথে ভাবাবেশে আচ্ছন্ন।

১২৪৪ সালের শীত মৌসুমের ঠিক আগে রুমির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় অবতার তুল্য উন্মত্ত ধরনের ক্রুদ্ধ ব্যক্তি তাবরিজের শামসের সঙ্গে। তিনি তাঁর সমপর্যায়ের একজন নিবিড় বন্ধুর সন্ধানে নিকট-প্রাচ্য চষে বেড়িয়েছেন। অনেক সময় শামস তিন দিন বা চারদিনের জন্য হারিয়ে যেতেন অতীন্দ্রিয় সচেতনতার মাঝে। কঠোর পরিশ্রমের কাজ করার মাধ্যমে তাঁর কল্পনাপ্রবণ বিহ্বলতার ভারসাম্য আনতে তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ নেন। তাঁকে যখন তাঁর মজুরি পরিশোধ করা হতো, তিনি স্থান ত্যাগ করার আগেই সেই অর্থ গোপনে অপর কোনো শ্রমিকের পকেটে ঢুকিয়ে দিতেন। তিনি কোথাও দীর্ঘদিন অবস্থান করতেন না। যখনই ছাত্ররা তাঁকে ঘিরে ধরত, যা তারা অনিবার্যভাবে করত, তিনি পানি পান করার অজুহাত দিয়ে তাঁর কালো রঙের আলখেল্লা জড়িয়ে সেখান থেকে কেটে পড়তেন। তাঁর অবিশ্রাম অনুসন্ধানের কারণে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন 'পরিন্দা' (পাখি) নামে। তিনি প্রার্থনা করতেন যে, আল্লাহ তাঁর যে বন্ধুকে আড়াল করে রেখেছেন তিনি অবশ্যই আবির্ভূত হবেন এবং ঐশ্বরিক

প্রেমের রহস্য সম্পর্কে তিনি আরও অধিক জানতে পারবেন। তাঁর অন্তর থেকে একটি কণ্ঠ ভেসে আসে: "বিনিময়ে তুমি কী দেবে?"

"আমার মাথা," শামস উত্তর দেন।

"তুমি যাঁকে খুঁজছ, তিনি কোনিয়ার বাহাউদ্দিনের পুত্র জালালুদ্দিন।"

১২৪৪ সালের ২৯ নভেম্বর শামস কোনিয়ায় পৌঁছেন এবং একজন সফল চিনি ব্যবসায়ীর ভান করে চিনি ব্যবসায়ীদের এক সরাইখানায় আশ্রয় নেন। কিন্তু তাঁর কক্ষে ছিল শুধু একটি মাটির ভাঙা পানির পাত্র, একটি ছিন্ন মাদুর, মাথা স্থাপনের জন্য এবড়োখেবড়ো একটি মাটির পিণ্ড। একদিন শামস সরাইখানার ফটকে বসে ছিলেন, এসময় ছাত্র পরিবৃত অবস্থায় গাধার পিঠে বসে সেখানে আসেন রুমি। শামস ওঠে দাঁড়ান এবং গাধার রশি তাঁর হাতে নেন।

"নিগূঢ় তাৎপর্যসম্পন্ন চালু মুদ্রা পরিবর্তনকারী, প্রভুর নামসমূহ জপকারী, আমাকে বলো, কে সেরা, মুহাম্মদ অথবা বোস্তামি?'

"দরবেশ ও রাসুলদের মধ্যে মুহাম্মদ অতুলনীয়।"

"তাহলে কীভাবে একথা বলা হয়েছে, 'আপনাকে জানা উচিত, কিন্তু আমরা আপনাকে জানতে পারিনি,' আর বোস্তামি বলেছেন, "আমার ঐশ্বর্য কত মহান!"

প্রশ্নের গভীরতা উপলব্ধি করে রুমি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। যখন তাঁর জ্ঞান ফিরল, তিনি উত্তর দিলেন, "মুহাম্মদের ক্ষেত্রে রহস্য সবসময় উদ্‌ঘাটিত ছিল, কিন্তু বোস্তামি এক গ্রাস গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট ছিলেন।"

উভয়ে স্খলিত পায়ে একসঙ্গে চলে গেলেন এবং 'সহবত' পরিভাষায় পরিচিত অতীন্দ্রিয় আলোচনায় টানা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এমনকি মাসের পর মাস কাটিয়ে দিলেন।

তাদের সাক্ষাৎ সম্পর্কিত আরেকটি বিবরণ পাওয়া যায়, তা হলো, একদিন রুমি কোনিয়ার এক ফোয়ারার ছোট এক চত্বরে ছাত্রদের পাঠ দান করছিলেন। ফোয়ারার পাশে খোলা অবস্থায় কিছু বই ছিল। শামস দ্রুত পায়ে ছাত্রদের মাঝখান দিয়ে এসে বইগুলো ঠেলে পানিতে ফেলে দিলেন।

"আপনি কে এবং এসব কী করছেন?" রুমি প্রশ্ন করেন।

"তুমি যা কিছু পাঠ করছিলে এখন তোমাকে সেসবের মাঝে কাটাতে হবে।"

রুমি ফোয়ারার মধ্যে বইগুলোর দিকে তাকালেন, যার মধ্যে একটি ছিল তাঁর পিতার মূল্যবান দিনপঞ্জি, 'মা'রিফ।'।

শামস বললেন, "আমরা এগুলো তুলে নিতে পারি। বইগুলো সবসময় যেমন শুকনো ছিল তেমন শুকনোই থাকবে।" রুমিকে দেখানোর জন্য তিনি পানি থেকে 'মা'রিফ তুললেন। সেটি সম্পূর্ণ শুকনো।

"ওগুলো ওখানেই থাকুক," রুমি বললেন।

বইগুলো এবং ধার করা সচেতনতা পরিত্যাগের মধ্য দিয়ে রুমির প্রকৃত জীবন এবং তাঁর প্রকৃত কবিতার সূচনা ঘটল। রুমি বলেছেন, "আমি আল্লাহ সম্পর্কে আগে যা ভেবেছি, আজ একজন মানুষের মধ্যে তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম।"

শামসের সঙ্গে সাক্ষাৎ রুমির জীবনের কেন্দ্রীয় ঘটনা ছিল। তাঁরা প্রায় সাড়ে তিন বছর একসঙ্গে কোনিয়ায় ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে রুমির ছাত্রদের ঈর্ষার কারণে শামসকে দুবার বিতাড়িত হতে হয় এবং দুবারই রুমি তাঁর ছেলে সুলতান ওয়ালাদকে পাঠান তাঁকে ফিরিয়ে আনতে। পরবর্তীতে কী ঘটেছে সে সম্পর্কে বিদ্বজ্জনদের মধ্যে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে। হয় শামস নিজেই চলে যান, কোনো নিশানা ছাড়াই নিরুদ্দেশ হন, অথবা রুমির এক পুত্র আলা আল-দীনসহ তাঁর কিছু ছাত্র ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে হত্যা করেন। শেষের ব্যাখ্যাটিই সুলতান ওয়ালাদ দ্বারা সূচিত মৌলবি তরিকার দরবেশদের মধ্যে মৌখিকভাবে চলে এসেছে।

এই ব্যাখ্যা অনুসারে শামসের মৃত্যুর পর তিনি স্বপ্নে দেখা দেন সুলতান ওয়ালাদকে এবং তাঁর কাছে তাঁকে হত্যার ঘটনা বর্ণনা করেন। সুলতান ওয়ালাদ এই দুঃখজনক সংবাদ পিতার কাছে প্রকাশ করেননি। তিনি পুত্রকে শামসের সন্ধানে দামেশক এবং অন্যান্য স্থানে পাঠান। এ পরিস্থিতি ইউসুফের কাহিনির বিপরীত এক ধরনের দৃষ্টান্তে পরিণত হয়, যার মধ্যে ইউসুফের ভাইয়েরা তাদের পিতা ইয়াকুবের কাছে ভান করেন যে, সেই প্রিয় একজন মারা গেছেন; একটি নেকড়ে তাঁকে হত্যা করেছে। এখানে রুমিকে বলা হয়নি যে, তাঁর প্রিয় একজনকে তাঁরই ছাত্রেরা হত্যা করেছে, যাদের একজন তাঁর পুত্র। দুটি কাহিনিতেই কেন্দ্রীয় চরিত্র বহু বছর ধরে তাদের প্রিয়তম ব্যক্তি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে বাস করেছেন। ইউসুফের কাহিনির নিষ্পত্তি চমৎকারভাবে ঘটে যখন ইউসুফ তাঁর স্বপ্নের মর্ম ব্যাখ্যা করার দক্ষতা প্রদর্শন করে মিশরের শস্যভান্ডারের দায়িত্বে নিয়োগ লাভ করেন এবং এরপর তাঁর পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলিত হন।

শামসের সঙ্গে রুমি পুনর্মিলিত হন কবিতায় এবং অন্তরের গভীরতম স্থানে। সম্ভবত তাবরিজের শামসের স্বকীয় উন্মাদনাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য একটি সনাতনী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে ধারণ করা সম্ভব হতো না, যদি না রুমির মতো একজন তাঁকে নিজের আত্মা ও চেতনার মাঝে ধারণ করতেন, যিনি বুনো স্বভাবের অজ্ঞেয়বাদী অভিজ্ঞতা এবং অধিকতর ঐতিহ্যগত বিশ্বাসের মধ্যে সেতুবন্ধন হতে পারেন। এই রহস্যজনক ঘটনা সামনে আসে শামসের সন্ধানে রুমির এক সফরের সময়। হঠাৎ দামেশকের রাস্তায় হাঁটার সময় রুমি অনুভব করেন যে, স্বয়ং তিনিই উভয়ের বন্ধুত্বের স্বরূপ এবং শামসকে অনুসন্ধান করার আর কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের একত্রে থাকার মধ্যে যে অলৌকিকত্বই থাকুক না কেন, তিনি এখন তাঁর নিজের মাঝে। তিনি শামসের অনুসন্ধান থামিয়ে দেন।

রুমির কবিতার অনুবাদক এবং তার জীবনী লেখক ফ্র্যাঙ্কলিন লুইস তাঁর ওপর ব্যাপক গবেষণা করেছেন। তিনি মনে করেন যে, শামসকে হত্যা করা হয়নি। বরং তিনি স্বেচ্ছায় কোনিয়া ছেড়ে চলে যান, সম্ভবত এ কারণে রুমির আত্মার বিকাশ আরেকটি পর্যায় পর্যন্ত বিকশিত হোক। এটা সত্য যে, শামস একজন অতীন্দ্রিয়বাদী ছিলেন এবং গতিশীলতাই ছিল তাঁর জীবন এবং সবসময় তা অধিক; যা কিছু আসুক, সবসময় অধিক আশীর্বাদ হিসেবে বর্ধিত হোক, ভাবাচ্ছন্নতার আরও প্রশংসা ছড়িয়ে

পড়ুক। শামসের ক্ষেত্রে এটি কঠোর চাপের কাজ ছিল, যা অন্যের ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব। শামস একবার বলেছিলেন যে, তুমি যদি কাবাকে তুলতে পারো এবং সেখান থেকে পৃথিবীর বাইরে বের করে আনতে পারো, তখন তুমি দেখতে পাবে আমরা সবাই কী ইবাদত করছিলাম— দিনে পাঁচবার ইবাদতের অনন্ত ঐশ্বর্য দেখা যেত পরস্পরের মাঝে। প্রচলিত ধর্মতত্ত্বে এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা কঠিন। রুমির তরিকার একটি অংশের মধ্যে এটি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হতো না যে, তাদের প্রিয় ওস্তাদ এমন একজন বুনো মানুষের সাহচর্যে পুরোপুরি মগ্ন হয়েছেন। এ প্রেক্ষিতেই ফ্র্যাঙ্কলিন লুইস মনে করেন যে, শামস স্বেচ্ছায় নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। এবং তাঁর রওজা মোবারক অন্য কোথাও আছে, কোনিয়ায় নয়; হয়তো তাবরিজের পথে 'খুয়ে' নামে এক নগরীতে। সেখানে তাঁর নামে একটি মিনার আছে। কিন্তু কোনোটাই নির্দিষ্ট নয়। শামস অধরাই রয়ে গেছেন।

প্রফেসর কোলম্যান বার্কস তার গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্বাস করেন যে, শামস প্রকৃতপক্ষে ঈর্ষাজনিত কারণে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। একটি বিষয় নিশ্চিত যে, শামসের নিখোঁজ হওয়া, তা সহিংসতার কারণেই হোক, অথবা তাঁর নিজের ইচ্ছায় হোক, এই দুঃখজনক ঘটনার পর শামসের কবিতার মর্ম গভীরতর হয়ে ওঠে। আাকাঙ্ক্ষার মূল আরো উজ্জ্বল ও আরো মুখ্য হয়ে ওঠে এবং শামস ও রুমির মহিমান্বিত বন্ধুত্বের মাঝে যে গভীরতা তা প্রতিফলিত হয় রুমির কবিতায়।

রুমির দুজন স্ত্রী ছিলেন। প্রথম জন গওহর খাতুন, যাঁর গর্ভজাত সন্তান আলা আল-দীন এবং সুলতান ওয়ালাদ। গওহর খাতুন ১২৪২ সালে ইন্তেকাল করেন। এরপর রুমি বিয়ে করেন কিরা খাতুনকে, যাঁর গর্ভজাত পুত্রসন্তান ছিলেন মুজাফফর এবং একজন কন্যাসন্তান ছিলেন মালিকা। কিরা খাতুন সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ কাহিনি আছে। রুমি এবং শামস যে কক্ষে উপবিষ্ট হয়ে আলোচনায় লিপ্ত ছিলেন, একদিন কিরা খাতুন সেই কক্ষের দরজার ছিদ্র দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে পান যে, কক্ষের একটি দেওয়াল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং ছয়জন মহিমান্বিত ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করলেন। অচেনা লোকগুলো কুর্নিশ করে রুমির পায়ে ফুল স্থাপন করলেন। তখন শীতের মাঝামাঝি। তারা ফজর নামাজের সময় পর্যন্ত ছিলেন। শামসের দিকে তারা ইশারা করেন নামাজে ইমামতি করার জন্য। তিনি কোনো অজুহাত দিলেন এবং রুমি ইমামতির দায়িত্ব পালন করলেন। নামাজ আদায় শেষ হলে ছয় জন লোক দেওয়াল ভেদ করে চলে গেলেন। রুমি কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সংলগ্ন কক্ষে স্ত্রীকে দেখে ফুলগুলো তার হাতে দিয়ে বললেন, "কিছু দর্শনার্থী ফুলগুলো তোমার জন্য এনেছে।"

পরদিন কিরা খাতুন ফুলের তোড়া থেকে কয়েকটি পাতা ও ফুল তার ভৃত্যের হাতে দিয়ে তাকে পাঠালেন সুগন্ধির বাজারে। সুগন্ধি বিক্রেতারা হতবুদ্ধি হয়ে গেল, তারা ফুলগুলো শনাক্ত করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত একজন হিন্দুস্থানি মসলা ব্যবসায়ী ফুলগুলো চিনতে পারলেন যে, এই ফুল কেবল সিংহলে (শ্রীলঙ্কা) জন্মায়।

এই অদ্ভুত খবর নিয়ে ভৃত্য বাড়ি ফিরে এসে যখন ঘটনাটি বলছিল, ঠিক তখনই রুমি উপস্থিত হয়ে কিরা বেগমকে বললেন ফুলগুলোকে যত্নসহকারে রাখতে। কারণ হিন্দুস্থানি দরবেশরা বেহেশত থেকে এ ফুল এনেছেন, মানুষ যে ফুল হারিয়ে ফেলেছিল। কিরা খাতুন যতদিন জীবিত ছিলেন (রুমির ইন্তেকালের উনিশ বছর পর তিনি ইন্তেকাল করেন), ততদিন ফুলগুলো তাজা ও সুগন্ধযুক্ত ছিল। এ ফুল চোখের কোনো অসুখে বা কোনো ক্ষতে ব্যবহার করা হলে তাৎক্ষণিক নিরাময় লাভ হতো।

আবেশে ঘূর্ণনকারী প্রথম দরবেশ হিসেবে জালালুদ্দিন রুমির নাম অবশ্যই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ধারণা করা হয় যে, দৈহিক ও শ্রবণ সংক্রান্ত ধ্যানের ('সেমা' অথবা 'সামা') এই প্রক্রিয়ায় রুমিকে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাবরিজের শামস। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কিছু অর্জনের চেষ্টা করে, তাহলে 'সামা'য় উপস্থিত হয়ে উচ্চারিত শব্দগুলো গভীর অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ এবং ঘূর্ণায়মান নৃত্য দর্শনের মাধ্যমে তা সম্ভব। সৃষ্টিকর্তার করে তার সৃষ্টি মানুষের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপনের উপায়ও 'সামা'। রুমি অনেক সময় তাঁর ঘূর্ণনের মাঝেই কবিতা রচনা করতেন। তিনি সুর ও কবিতা এবং গতিকে আত্মায় একত্রিত করতেন, যা ছিল তাঁর আত্মার কাজকে বিকশিত করার জন্য। তিনি তাঁর এক সংলাপে বলেছেন :

"প্রথম খলিফা আবুবকরের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে আল্লাহ রোমানদেরকে তাঁর ক্ষমাশীলতার অন্যতম প্রধান প্রাপক এবং রোমান আনাতোলিয়াকে সকল ভূখণ্ডের মধ্যে সুন্দরতম হিসেবে উপহার দিয়েছেন। এই স্থানের লোকজন যেহেতু এমন মহিমা গ্রহণ করতে পারেনি, তারা অন্তর্নিহিত জীবন অথবা অদৃশ্য জগতের স্বাদ সামান্যই পেয়েছে। সেজন্য আমি খোরাসানের (পারস্য) আকর্ষণ থেকে দূরে চলে গেছি, যাতে আমার তরিকার সন্তানেরা রোমান তাম্রকে রূপান্তরিত করতে পারে সুবর্ণে। এই আলকেমির কারণে তারা নিজেদের দার্শনিক প্রস্তরে পরিণত করবে। কিন্তু আমি যে উপঢৌকন প্রদান করেছি, রোমান আনাতোলিয়া যেহেতু তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, সেজন্য সেখানকার বাসিন্দাদের আধ্যাত্মিক পথে প্রবেশ করানোর জন্য উদ্ভাবন করেছি সুর সহযোগে কবিতা আবৃত্তির। এই অঞ্চলের মানুষ অত্যন্ত অনুগ্রহধন্য, প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ, কৌতূহলী এবং শিল্পপ্রিয়। কিন্তু একটি অসুস্থ শিশুকে ওষুধ খাওয়াতে অবশ্যই তাকে যেমন মিষ্টি দ্বারা তুষ্ট করতে হয়; অনুরূপ তাদেরকে কবিতার দিকে টানতে হবে আত্মার প্রতি আকাঙ্ক্ষা অর্জনের জন্য।"

জীবনীসংক্রান্ত উৎসগুলো থেকে আমাদের কাছে অনেক কাহিনি উঠে এসেছে; রুমি এবং শিশুদের নিয়ে, রুমি এবং ভিক্ষুক, সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং বিশেষ করে রুমি এবং জীবজন্তু সম্পর্কিত কাহিনি। জান্তব মন নিয়ে তিনি বলেছেন এবং তিনি জন্তুর ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিলেন। প্রতিবছর রুমি কোনিয়ার কাছে এক জায়গায় যেতেন, যেখানে উষ্ণ ঝরনা ছিল। বড় একটি হ্রদের পাশে আয়োজিত হতো সংগীত উৎসব এবং রুমি তাঁর সংলাপ উপস্থাপন করতেন। একদিন হ্রদে ভেসে বেড়ানো হাঁসগুলো এত চিৎকার করে ডাকাডাকি করেছিল যে, সমবেত

লোকজন রুমির কথা শুনতে পাচ্ছিল না। রুমি হাঁসগুলোর উদ্দেশে চিৎকার করলেন, "হয় তোমরা কথা বলো, আর তা না হলে আমাকে বলতে দাও।" সম্পূর্ণ নীরবতা নেমে এলো এবং সেখানে তাঁর অবস্থানের অবশিষ্ট সপ্তাহগুলোতে কোনো হাঁস আর কোলাহল করেনি। যখন তাঁর কোনিয়ায় ফিরে যাওয়ার সময় হলো, তিনি হ্রদের কিনারায় গিয়ে হাঁসগুলোকে অনুমতি দিলেন তাদের যত খুশি কোলাহল করতে ইচ্ছা হয়, তারা তা করতে পারে। এরপর আবারও হাঁসের ডাকাডাকি শুরু হয়।

রুমি-প্রেমিকদের ভালো লাগার মতো আরেকটি কাহিনি আছে। কিছু কসাই একটি বকনা-বাছুর কিনে নিয়ে যাচ্ছিল সেটিকে জবাই করার জন্য। হঠাৎ বাছুরটি রশি থেকে আলগা হয়ে দৌড় দিলো। কসাইরা চিৎকার করতে লাগল এবং তাতে বাছুরের দৌড় আরও দ্রুত হলো। কেউ সেটির কাছে পৌঁছতে পারছিল না। রুমি তাঁর মুরিদদের নিয়ে একই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। মুরিদরা তাঁর থেকে কিছুটা পেছনে। বকনা-বাছুরটি তাকে দেখে লাফিয়ে তাঁর কাছে এসে অবিচল ভঙ্গিতে তাঁর পাশে দাঁড়াল, যেন বাছুরটি নিজের আত্মার সঙ্গে কথা বলছে। তিনি বাছুরের গায়ে হাত রাখলেন এবং গলায় আদর করলেন। কসাইরা এসে যখন তাদের সম্পত্তি দাবি করলে তিনি তাদের কাছে বাছুরের প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। তাঁর মুরিদরাও এসে আলোচনায় অংশগ্রহণ করল। পরিস্থিতিকে কাজে লাগালেন রুমি; "একটি সহজ-সরল প্রাণী, যেটিকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেটি যদি আমার সঙ্গে এত মনোরম আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে, তাহলে একজন মানুষ যদি তার হৃদয় ও আত্মাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে, তাহলে তা কতটা মহিমাময় ও সুন্দর হতে পারে!" তাঁর উচ্চারিত শব্দগুলোর মাধুর্যে উপস্থিত পুরো জনসমষ্টি— দরবেশ, কসাই সকলের মাঝে এতটা ভাবাবেশের সৃষ্টি হলো যে, তারা গান গাইতে এবং নৃত্য করতে লাগল। এমনকি রাতে তারা কবিতার আসর উপভোগ করল স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

প্রাণীবিষয়ক শেষ কাহিনিটি হচ্ছে; একদিন রুমি নগরীর চত্বরে তাঁর স্বাভাবিক সংলাপের চেয়ে দীর্ঘ বক্তব্য দিচ্ছিলেন। লোকজন চলে যাচ্ছিল। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পথে। শেষ পর্যন্ত সেখানে রয়ে গেল সাতটি কুকুর, যেগুলো সামনের পা সোজা রেখে নিতম্বে ভর দিয়ে সারিবদ্ধভাবে বসেছিল। রুমি বললেন, "এরাই আমার সত্যিকার মুরিদ।"

রুমি তাঁর জীবনের শেষ বারো বছর ধরে লিখেছেন অথবা বলেছেন তাঁর সুদীর্ঘ দীপ্তিমান কবিতা 'মসনবি'। ছয় খণ্ডে চৌষট্টি হাজার লাইন। বিশ্ব সাহিত্যে এর সমতুল্য আর দ্বিতীয়টি নেই। এটি বহু বিষয় সংবলিত সাগরের মতো বিস্তৃত। আত্মগত ব্যাখ্যার রূপকল্প; অনেক সময় রসাত্মক, এমনকি অশ্লীল; আত্মার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিবরণী। রূপকথা, রসিকতা, মানুষ সম্পর্কে মন্তব্যের পাশাপাশি কুরআনের আয়াত থেকে উদ্ধৃতি উঠে এসেছে কবিতায়। রুমি এই মহিমান্বিত শিল্পকর্ম তাঁর লিপিকার হুশাম সেলেবিকে বলে গেছেন কোনিয়ার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে, 'মেরাম' নামে নিকটস্থ এক উদ্যান দিয়ে অতিক্রম করতে করতে, ছাত্রদের তালিম দেওয়ার সময় এবং পথে পথে ও জনবহুল স্থানে। হুশাম ছিলেন শামসের

ছাত্র; অতএব এই দীর্ঘ কবিতাকে সংলাপের বর্ধিতাংশ এবং বন্ধুদের সাথে মিলনের কাহিনি বলা যেতে পারে। যেভাবে তিনি তাঁর অনুসারীদের সাথে কথা বলতেন সম্ভবত সেভাবেই একীভূত বৈচিত্র্যের সর্বোত্তম উপস্থাপন করেছেন। কখনো অনুসারীদের আত্মিক বিকাশের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন; আবার কখনো ব্যক্তির প্রয়োজন মেটানোর কথা ভেবেছেন। 'মসনবি'র পাঠকরা যেকোনো দিক থেকে এর মাঝে প্রবেশ করতে পারেন।

১২৭৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর সূর্যাস্তের সময় রুমি মারা যান। প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ লোক কোনিয়ায় তাঁর রওজা মোবারক পরিদর্শন এবং এই মহান সুফি কবির রুহের মাগফিরাতের জন্য মোনাজাত করতে গমন করেন। রুমি গবেষক কোলম্যান বার্কস লিখেছেন, "একবার আমি স্বপ্নে দেখি, আমি রুমির রওজা মোবারকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছি এবং রুমি বাইরে থেকে আসছেন। আমি দরজার কাছে আসতেই তাঁর উৎসাহী অনুরাগীরা তাঁকে এমনভাবে ঘিরে ধরল যে, আমি আর তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। যারা তাঁকে ভালোবাসত তিনি তাদের সবার মতো হয়ে গেলেন। তাদের মাঝে হারিয়ে গেলেন তিনি। তাঁর রওজা মোবারকের গায়ে উৎকীর্ণ রয়েছে, 'এখানে তাঁর সন্ধান করো না, বরং তারা যাকে ভালোবাসে তাদের হৃদয়ে খুঁজো।' বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর শেষকৃত্যে সকল ধর্মের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। যখন প্রশ্ন করা হয়, তারা কেন? প্রত্যেকে উত্তর দেন, রুমি এবং তাঁর কবিতা তাদের বিশ্বাসকে গভীরতর করার উপায় ছিল। এই সংকলনে এবং আমি রুমির যা কিছু অনুবাদ করেছি, তাতে এই সর্বজনীনতার দিকটিকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছি। ব্যাপক জ্ঞানের আধার এই অস্থিরমতি কবিকে একুশ শতকে আমরা যেভাবে ধর্মে ধর্মে বিভাজিত হয়ে গেছি তা তুলে ধরা আমার কাছে সঠিক মনে হয়নি, বরং আমরা কীভাবে একটি পরিবারের মতো এই রহস্যের মাঝখানে ঘুরছি সেটিই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে।"

তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীকে বলা হয় 'উরস' বা বিয়ের রাত। তিনি তাঁর প্রিয় একজন, অর্থাৎ বন্ধুর উপস্থিতি অনুভব করেন, যা অনেকটা নিশ্বাস নেওয়ার মতো স্বাভাবিক। সেই বন্ধুর সঙ্গে মিলন সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রাণ সঞ্চার করে। তাঁর রওজা মোবারকের ভেতর দরজার ঠিক ওপরে একটি ক্যালিগ্রাফি আছে, যা শামস তাবরিজের আঠারো অধ্যায়ের শুরুতে রয়েছে:

"আমি আমার প্রিয়তমার,
আমি দুই বিশ্বকে একটি দেখেছি,
এবং সেই একটি ডাকে ও জানে,
প্রথম, শেষ, বাহির ও ভেতর,
মানুষ শুধু সেই নিশ্বাস নেয়।"

শামস তাবরিজের আত্মার মূল :

জালালুদ্দির রুমির সংক্ষিপ্ত জীবনীগুলোতে তাবরিজের শামসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ওপর অধিক আলোকপাত করার বিষয় লক্ষ করা যায়। তাঁদের গভীর, আধ্যাত্মিক নিবিড় বন্ধুত্বের কথা রুমির কবিতায় উঠে এসেছে, যে কবিতাগুলোর সংকলিত রূপকে রুমি বলতেন, 'বড় লাল গ্রন্থ', বা 'দিওয়ান-ই-শামস তাবরিজ' (শামস তাবরিজির কাজ)। এটি 'শামস' নামেও পরিচিত এবং বিশ্ব সাহিত্যে একটি মহান অবদান হিসেবে স্বীকৃত। কোলম্যান বার্কস তাঁর 'দ্য সোল অফ রুমি'তে প্রায় তিন হাজার লাইন কবিতা অন্তর্ভুক্ত করেছেন, প্রকৃত 'দিওয়ান' এর চেয়ে ছয়গুণ বড়।

বার্কসের মতে, 'এই কবিতাগুলো এসেছে রুমি ও শামসের বন্ধুত্ব থেকে। তাদের আন্তরিক উপস্থিতিই এসব 'গজল' ও 'রুবাই'-এর উৎস ও শক্তি। আমরা যদি কখনো ধরাছোঁয়ার উর্ধ্বে থাকার রহস্যময় ব্যক্তিত্ব শামসের সঙ্গে মিলিত হতে পারি, তাহলে সেটি হবে প্রায়শ উচ্চারিত রুমির বিভিন্ন মন্তব্যে যে, 'তিনি জানতেন না, কোথা থেকে তাঁর ভাষা আসছে এবং কে এর স্রষ্টা।' শামস তাঁর দিওয়ানে বলেছেন: মাওলানা (রুমি) জানেন যে, লেখক তিনটি বাণী লিখেছেন:

> "একজন জানেন, তিনি পড়তে পারেন এবং শুধু তিনিই,
> একজন, তিনি এবং অন্যেরা পড়তে পারেন,
> এবং একজন, তিনিও নন অথবা আর কেউ পড়তে পারেন না।
> আমি সেই তৃতীয়জন।"

অতএব, স্বয়ং শামস কবিতার এই শব্দগুলোতে উপস্থিত, এই বাণীর স্বীকারযোগ্য অংশ। রুমির মাঝে প্রবেশ করা আরও সহজ।

রুমি মহাত্মাদের অন্যতম এবং অন্যতম আধ্যাত্মিক গুরু। তিনি আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে আমাদের ঐশ্বর্য কী। তিনি আরো জীবন্ত হতে চান, জাগ্রত হতে চান। মনে হয়, মাওলানা নিজে নিদ্রাভঙ্গের সংকেত থেকে জেগে উঠেছেন আমাদের জাগ্রত করার জন্য আধ্যাত্মিক বিউগলের আওয়াজে। তিনি চান, আমরা আমাদের নিজেদের সৌন্দর্য দেখি, আয়নায় এবং পরস্পরের মাঝে।

বিভিন্নভাবে রুমির বাণীকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যা প্রতিটি ধর্মের নির্যাসেরও মূল। একজন মানুষের আকাঙ্ক্ষা হলো সীমাহীন স্বাধীনতা ও আনন্দের মধ্যে বাস করা, সৌন্দর্যের একেবারে ভেতরে বিচরণ করা— মানুষের আত্মার গভীর প্রয়োজনে নামহীন অস্তিত্বের সাথে অবয়বের মাঝ দিয়ে বয়ে যায়, জীবন্ত হয় বাষ্প, কুয়াশা, পানির প্রবাহ, থুতু, রক্ত, সমুদ্র, মেঘ, কফি, মদ, প্রজাপতি, হামিং বার্ড, শক্তি ও আনন্দের মতো।

কোলম্যান বার্কস নিজেকে আশীর্বাদ ধন্য বলে অনুভব করেছেন যে, তিনি তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অর্ধেক সময়ে রুমির কবিতার ওপর কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি রুমির ওপর কাজ শুরু করেন ১৯৭৬ সালে, যখন তাঁর বয়স উনচল্লিশ বছর। মিনেসোটার অ্যালিতে রবার্ট ব্লাই এর 'গ্রেট মাদার কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হচ্ছিল এবং

তিনি সেখানে এ জে আরবেরির অনুবাদে রুমির ‘গজল’-এর একগাদা বই এনেছিলেন। একদিন বিকেলে তিনি প্রস্তাব করেন যে তারা রুমির কবিতার ওপর লেখার চর্চা করতে পারেন। তারা আরবেরির পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুবাদকে ওয়াল্ট হুইটম্যান, উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামস এবং গ্যালওয়ে কিনেলের কবিতার ধারার মতো অবাধ প্রাঞ্জল কবিতার রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। তার কাছে এটি ছিল প্রথম দেখায় প্রেমের মতো, যদিও ব্যাপারটিকে তিনি অনেকটা একান্তে, নিজের মাঝেই রেখেছিলেন।

বার্কস লিখেছেন: “জর্জিয়ার এথেন্সে ফিরে ইংরেজি বিভাগে একদিন পর পর সপ্তাহে তিনটি ক্লাস নিচ্ছিলাম; কবিতার ব্যাখ্যা করছিলাম। ক্লাস শেষে ব্লুবার্ড ক্যাফেতে যেতাম, তখন এটি ছিল হাল এবং ওয়াশিংটনের কর্নারে। এক কাপ কফি নিয়ে বসতাম এবং আমার নতুন আবিষ্কৃত একনিষ্ঠতার মাঝে হারিয়ে যেতাম। যুক্তি ও ব্যাখ্যার মনকে পেছনে রেখে বুঁদ হয়ে যাওয়ার মধ্যে কী যে স্বস্তি। এই কবিতাগুলোকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এর মাঝে প্রবেশ করতে হয়, বাস করতে হয়। এরপর ১৯৮৪ সালে ‘থ্রেশহোল্ড বুকস’ রুমির কবিতার ওপর আমার প্রথম অনুবাদ ‘ওপেন সিক্রেট’ প্রকাশ করার পূর্ব পর্যন্ত আটটি বছর আমি রুমির মাঝে প্রবেশ করেছি, তাঁর সঙ্গে বাস করেছি। কবিতা আমার কাছে অনুদ্‌ঘাটিত রহস্যে পরিণত হয়েছিল। ১৯৭৬ সালের শীতকালের আগে আমি যখন আরবেরির অনুবাদ প্রথম পড়তে এবং নতুনরূপে সাজানোর কাজ শুরু করি, একটি আদিম উপস্থিতির মাঝে নতুন যে স্বাধীনতা বোধ করি, তা ছিল আত্মাকে সমৃদ্ধ করার অনুভূতি, আমার জন্য এক ধরনের অনুশীলন।

“আমার এক বন্ধু ছিলেন, যিনি কারাগারে কাজ করতেন। তিনি বলতেন, বন্দিরা তাদের মধ্যে একটি শব্দ ব্যবহার করত, তারা যেখানে আছে তা ব্যক্ত করার জন্য, ‘ইন মিডিয়াম’। অনুশীলন সম্পর্কিত একটি সুফি কাহিনি প্রচলিত আছে। কারাগারে এক বন্দির সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন তার বন্ধু। বন্দি আশা করছিলেন যে তার বন্ধু তাকে কারাগার থেকে পলায়ন করতে সাহায্য করবে, কিছু লোককে সাথে এনে অথবা কোনো সরঞ্জাম এনে, যাতে তার পক্ষে পলায়ন করা সহজ হয়। কিন্তু লোকটি সাথে এনেছিলেন একটি জায়নামাজ। বন্দি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে শুরু করলেন এবং একটি সময়ের পর তার উপলব্ধি হলো, জায়নামাজের যে জায়গায় তার কপালের স্পর্শ লাগছে, যেটি কিবলা, সেখানে তার প্রকোষ্ঠের তালা খোলার চাবির একটি রেখাচিত্র। বন্দি পলায়ন করেন। চৌত্রিশ বছর ধরে আমি এই অনুশীলনের মাঝে ছিলাম।

“রুমি প্রায়ই একটি পাখির কথা বলেছেন, খাঁচা খোলা থাকা সত্ত্বেও পাখিটি খাঁচার মধ্যে বসে থাকত। সেটি উড়ে যেত না। কখনো কখনো আমি সেই পাখির মতো অনুভব করতাম। একবার এক শিক্ষক আমাকে বলেছিলেন যে অনুবাদগুলো চমৎকার হয়েছে (তাই হতে হবে, কারণ এগুলো আসছিল রুমির প্রেম থেকে)। কিন্তু এর মধ্যে আমার জন্য একটি বিপদ ছিল, কারণ এগুলো ভাবাবেশের আত্ম-

সম্মোহনে পরিণত হতে পারে। একটি সময় পর্যন্ত তাই ছিল। রুমির কবিতার সৌন্দর্যের প্রতি আমার ভালোবাসা যথেষ্ট অনুভূত হলেও তা পর্যাপ্ত ছিল না।

"কবিতার অর্থ হলো, শ্রোতাকে একটি অভিজ্ঞতার দিকে চালিত করা, একটি উপস্থিতি বা অস্তিত্বের দিকে নেওয়া। এ ধরনের একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি। আমার বন্ধু গ্যালওয়ে কিনেল আঙুল দিয়ে আমাকে একটি গুহার দিকে দেখান। তাঁর ডান হাত প্রসারিত পর্বতের একটি পাশের দিকে, যেখানে সেই গুহার প্রবেশপথ। এর ওপর লেখা, 'রাসা শামসি'। হিন্দিতে 'রাসা'র অর্থ মূল বা নির্যাস। আমি ডান দিকের পথ ধরে হেঁটে গুহায় প্রবেশ করি এবং নলাকৃতির একটি গভীর খাদ দেখতে পাই, যেটি ওপর থেকে নিচে নেমে গেছে। সেই খাদের দেওয়ালে দরবেশরা ধ্যানমগ্ন, যেন তারা এক একটি বড় আকৃতির মোমবাতি। জায়গাটি আগুনে উদ্ভাসিত এবং প্রশান্ত। হয়তো গুহাভ্যন্তরের অনুসারীরাই শামস তাবরিজের মর্ম। তিনি সেখানে শারীরিকভাবে উপস্থিত নেই। একটি বড় চারকোনা বিশিষ্ট কাঠের আসন রয়েছে, সেটি শূন্য। আসনটি পাতালমুখী। আমাকে সেই শূন্য আসনের বাম পাশে বসার জন্য ইশারা করা হলো। ডানদিকে অন্য কেউ বসবেন। এই বিশাল মিলনায়তনে উপস্থিতির অনুভূতি এবং ধ্যানমগ্ন ব্যক্তিদের বিশালতার একটি ভাবমূর্তি আমার সাথে অবস্থান করে। আমি দাবি করতাম যে শামসের উপস্থিতি ছিল উচ্ছ্বাস-উত্তেজনার মধ্যে। আমি অনুভব করি যে প্রথম যখন আমি আরবেরির অনুবাদ নিয়ে কাজ শুরু করি, এটি নিঃসন্দেহে জাঁকজমকপূর্ণ একটি সূচনা ছিল।

"রুমির কবিতার ভেতর এমন কী রয়েছে, সে সম্পর্কে আমি আমার উপলব্ধি সম্পর্কে বলতে চাই। মানুষের সচেতনতার ওপর 'প্লটিনাস' (মিশরে জন্মগ্রহণকারী গ্রিক দার্শনিক, ২০৫-২৭০ খ্রিস্টাব্দ) এর একটি চমৎকার রূপক আছে, তা সমুদ্রে জাল ফেলার মতো। এটিই আমাদের আকাঙ্ক্ষা, শিল্পকর্ম এবং আমাদের প্রেম। এটি একটি জাল এবং আত্মা এক সমুদ্র, যার মধ্যে আমরা বিরাজ করি। কিন্তু আমরা এটি ধারণ করতে পারি না। যার মধ্যে আমরা সাঁতার কাটি, আমরা সেটির কোনো অংশ নই, প্রেমের রহস্যও তাই। তবুও আমরা যে আকাঙ্ক্ষা অনুভব করি তা আত্মার কারণে। আমরা অনেকটা তাই, যা আমরা আকাঙ্ক্ষা করি। সমুদ্রের একটি অংশ মাছের মধ্যে সাঁতার কাটে। 'প্লটিনাস' এর দৃষ্টিতে দৃশ্যবান বিশ্ব, সমগ্র মহাকাশ স্বয়ং আমাদের প্রকৃতি এবং আমরা যা করি তা হলো আত্মার সমুদ্রে জাল ফেলার কাজ।"

একজন রুমি-গবেষক বলেছেন: "মহাকাশ হচ্ছে, সমুদ্রে ফেলা একটি জালের মতো, জালের যা নিজস্ব তা নিয়ে তার করার কিছু নেই। সমুদ্র অতি বিস্তৃত এবং জাল যত সম্ভব বিস্তৃত হয়। এর কোনো অংশ যেখানে আছে সেখান থেকে আর কোথাও যেতে পারে না। কিন্তু এর যেহেতু কোনো আকার নেই, আত্মার প্রকৃতি সমগ্র মহাজাগতিক অস্তিত্বকে পর্যাপ্তভাবে একটি থাবার মধ্যে ধারণ করতে পারে।"

এ পরিস্থিতির মধ্যে একদিকে রয়েছে প্রচণ্ড তীব্রতা, সৌন্দর্য ও আকাঙ্ক্ষা এবং 'প্লটিনাস'কে এখানে পুনরায় ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে। যখন আমরা সেই সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে শুরু করি, তখন আমরা নিজেরা আরো সুন্দরও হয়ে যাই।